ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 07. No. 01. June 2012

বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সমস্যা: একটি পর্যবেক্ষণমূলক সমীক্ষা

মো. সুলতান মাহমুদ*

Abstract: The Paper is to analyze the challenges of institutionalization of democracy in Bangladesh. In this connection the theoretical framework of institutionalization of democracy has been discussed in this paper. However, the major emphasis is on the challenges of democratization in Bangladesh concretely in the light of theory. It analyses the various theories of institutionalizing democracy and examines Bangladesh's progress toward democratic consolidation using some indicators: the organization of free and fair election, the establishment of rule of law, the guarantee of fundamental freedom, nature of political culture and participation and the role of civil socity. Finally I have discussed the prospects of institutionalization democracy in Bangladesh which are the demands of of the democratic state.

ভূমিকা

যেকোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা চর্চার মাধ্যম হিসেবে এসব প্রতিষ্ঠানের সুস্পষ্ট বিন্যাস ও কর্মকাণ্ডের দ্বারাই প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ নিশ্চিত করা যায়। মনীষীগণ রাজনৈতিক উন্নয়ন, গণতন্ত্রের কার্যকারিতা, সমাজের উত্তরণ ও কার্যকরী জনসংগঠন প্রতিষ্ঠার জন্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের ওপর জোর দিয়েছেন। রাজনৈতিক ব্যবস্থার নির্মাণ তখনই সম্ভবপর হয় যখন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হয় ও তৎপর থাকে।[১] সমাজে বিদ্যমান ক্রিয়াশীল প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের সমষ্টি যখন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও স্থিতিশীল হওয়ার ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করে তখন প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ সম্ভব হয়। প্রাতিষ্ঠানিকীরণের গুরুত্ব উল্লেখ করতে গিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এস পি হান্টিংটন মত প্রকাশ করেছেন যে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকৃতপক্ষে সমার্থক ব্যাপার।[২] এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে, বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশে গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে

* প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অনুশীলন নেই বললেই চলে। এতে গণতন্ত্রের যথাযথ বিকাশ ও জনগণের সেবার মানের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক উন্নয়ন কোনোভাবেই আশানুরূপ হচ্ছে না। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রায় ৪১ বছর অতিবাহিত হলেও স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা বার বার বিভিন্ন বাধায় হোঁচট খেয়েছে। কখনো গণতন্ত্রের মূল ধারায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়নি।

প্রগতিশীল ও আলোকিত সরকার ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি হিসেবে গণতন্ত্রকে বিবেচনা করা হয় । শিক্ষিত ও সচেতন নির্বাচকমণ্ডলীর ওপর সঠিক গণতন্ত্র নির্ভরশীল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসনের মতে, গণতন্ত্র সত্যিকার অর্থে সভ্যতার এমন এক পর্যায়ের ওপর নির্ভরশীল যেখানে সভ্য জনগণ অন্যের অধিকার ও প্রয়োজনকে সম্মান করতে জানে। গণতন্ত্রের দুটি মৌলিক উপাদান হচ্ছে সমাজে যেকোনো ব্যক্তির ক্ষমতায় আরোহণের সমান সুযোগ সুনিশ্চিত করা, যার ফলে জনগণ সার্বজনীন স্বাধীনতাকে সমানভাবে উপভোগ করতে পারবে, সংক্ষেপে গণতন্ত্র হচ্ছে রাজনৈতিক চর্চার স্বাধীনতা, বক্তব্য রাখার স্বাধীনতা এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতাকে নিশ্চয়তা দেয়ার সুযোগ। খোলা মনে গণতন্ত্রের চর্চা, সংরক্ষণ ও শিক্ষার স্বার্থে নিয়মিতভাবে নির্বাচন, জনপ্রিয় পদ্ধতিতে ভোট দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা দরকার যেখানে বলপ্রয়োগ অথবা দমননীতির কোনো অবকাশ থাকবে না। গণতন্ত্রই একমাত্র সরকার পদ্ধতি যেখানে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এবং সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী তাদের অভিমত প্রকাশের অধিকার লাভ করে এবং নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় তাদের প্রভাব বিস্তারের সুযোগ সৃষ্টি হয়। গণতন্ত্রে রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করার ব্যাপক সুযোগ বিরাজমান।[৩] গণতন্ত্রের মূল যে চেতনা বা লক্ষ্য তা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সর্বোত্তম পর্যায়ে কখোনই পৌঁছাতে সক্ষম হয়নি। গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠনিকীকরণে বেশ কিছু সমস্যা এখন পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীরণের কী কী সমস্যা ও এর নানাবিধ পর্যায় বিশ্লেষণ করায় চেষ্টা করা হবে।

সমস্যার বর্ণনা

বাংলাদেশের নির্বাচিত সরকারগুলোর দলীয় ও ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার এবং স্বেচ্ছাচারিতার ফলে ক্রমেই আইনের শাসন ভঙ্গুর হয়ে যাচ্ছে। বিচারবিভাগ বিশেষত নিম্ন আদালত আমলা, পুলিশ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সরকারের নিয়ন্ত্রিত কর্মকাণ্ডের ফলে এগুলোর স্বায়ত্বশাসন ও কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছে। শক্তিশালী ও কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মূল উপাদানগুলো যথাযথভাবে ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। সংসদ নির্বাচনগুলো অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক হওয়া সত্বেও অর্থাৎ সরকারি ও বিরোধী দল সংসদে কাছাকাছি সংখ্যার আসন পেলেও সংসদ কখনোই কার্যকর হয়নি। কেননা ৯০ পরবর্তী প্রতিটি সরকারের সময়েই প্রধান বিরোধী দল সংসদ অধিবেশ বর্জন করে। ক্ষমতা পুরোপুরি প্রধানমন্ত্রীর হাতে থাকে যদিও সংসদীয় সরকারের রীতি অনুযায়ী তা হওয়ার কথা নয়।[৪]

বাংলাদেশে সাধারণত দু'জন প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পর্যায়ক্রমে হাত বদল করেছে তন্মধ্যে একজন বেগম খালেদা জিয়া এবং অন্যজন শেখ হাসিনা।

অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিতকরণের জন্য বাংলাদেশে এক অনন্য পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয় তাহলো তত্ত্বাবধায়ক সরকার। ১৯৯০ সালে ব্যাপক গণ-আন্দোলনের মুখে স্বৈরশাসক এরশাদের পতন ঘটলে ১৯৯১ সালে অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, উক্ত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ছিলেন বিচারপতি শাহবুদ্দীন আহমদ। পরবর্তীতে ১৯৯৪ সালে বিএনপি সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কারচুপিপূর্ণ নির্বাচন বিশেষ করে মাগুরা উপনির্বাচনের তীক্ত অভিজ্ঞতা সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধান সংযুক্ত করার দাবি ওঠে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে ১৯৯৪, ৯৫ ও ৯৬ সালে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি এবং জামায়াত ইসলামী অভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে মোট ৯৬ দিন হরতাল, অবরোধ এবং অসহযোগ কর্মসূচি পালন করে। এসব কর্মসূচিতে সকাল-সন্ধ্যা হরতালের পাশাপাশি একটি লাগাতার ৯৬ ঘণ্টা, দু'টি ৭২ ঘণ্টা এবং পাঁচটি ৪৮ ঘন্টীয় হরতাল ডাকা হয়।[৫] ১৯৯৬ সালে খালেদা জিয়া সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত একতরফা নির্বাচনে আওয়ামী লীগসহ বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন বর্জন করে। ফলে বিএনপি সরকার গঠন করলেও বৈধতা অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। বিশেষ করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে বিরোধী দল, সাধারণ মানুষ, সিভিল সোসাইটি, গণআন্দোলনের সূত্রপাত ঘটায় ফলে সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ ও অসহযোগিতামূলক আচরণ করতে থাকে। এক পর্যায়ে বিএনপি সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইন পাশ করে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে প্রধান উপদেষ্টা করে সরকার থেকে চলে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না।[৬]

৯০ দিনের মধ্যে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানই ছিল এ সরকারের মূল দায়িত্ব, পরপর দু'টি সাধারণ নির্বাচন জুন, ১৯৯৬ ও অক্টোবর, ২০০১ সালে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ২০০১ সালে নির্বাচিত বিএনপি সরকারের সময়ে নির্বাচন কমিশন গঠনকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৪ দলীয় জোট মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি। তাদের বক্তব্য হলো নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ নয়। কিন্তু সরকার তাদের এই অভিযোগ বারবার প্রত্যাখ্যান করে। পরবর্তীতে ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে নির্ধারিত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত জোট নির্বাচন বর্জন করার সিদ্ধান্ত নেয়। ইতোমধ্যে ২০০৬ সালের ২৭ অক্টোবর দেশ এক গভীর সংকটে পতিত হয়। এ সময়ে বিএনপি সরকারের মেয়াদ শেষ হলে (অব:) বিচারপতি কে এম হাসানের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব নেয়ার কথা থাকলেও আওয়ামী লীগসহ বিরোধী দলগুলোর প্রচণ্ড আপত্তির কারণে কে এম হাসান নিজেই এ পদ নিতে অস্বীকৃতি জানালে দেশে চরম সহিংসতার সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের সাংবিধানিক সকল স্তর যথাযথভাবে প্রয়োগ না করে রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহমেদ তার অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করলে দেশে আরো প্রকট ঘোলাটে পরিস্থিতির উদ্ভব

হয়। ২০০৬ সালের ১১ ডিসেম্বর ইয়াজউদ্দিন সরকারের চার উপদেষ্টা এক যোগে পদত্যাগ করলে নির্ধারিত ২২ জানুয়ারি ২০০৭ সালের নির্বাচন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ১১ জানুয়ারি ২০০৭ সালে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা সেনাবাহিনীর সহযোগিতা নিয়ে দেশে জরুরী অবস্থা জারি করে প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে সরে দাঁড়ান। পরদিন বাংলাদেশে ব্যাংকের সাবেক গভর্ণর ও বিশ্বব্যাংক কর্মকর্তা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ-র সামরিক সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়।[৭] সাংবিধানিক বৈধতা অর্জনের জন্য মূলত সামরিক বাহিনী বেসামরিক সরকারের নেতৃত্বে রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

যদিও এ সরকার ব্যবস্থাকে সামরিক সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলে আখ্যা দেয়া হয় কিন্তু খুব শীঘ্রই এ সরকার অন্তর্বর্তীকালীন সরকার হিসেবে দুটি গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্য হাতে নেয়। এর মধ্যে একটি হলো অবাধ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু সাধারণ নির্বাচন নিশ্চিতকরণ আর অন্যটি হলো প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক সংস্কার সাধন। সরকার ডিসেম্বর ২০০৮ সালের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের অঙ্গীকার করে নিজেই দু'বছরের সময় বেধে দেয়। এ সরকার নতুনভাবে নির্দলীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠন করে যারা সকল রাজনৈতিক দল ও সিভিল সমাজের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়। পুনর্গঠিত নির্বাচন কমিশন নির্বাচনকে সামনে রেখে নানাবিধ কর্মসূচি হাতে নেয়।

এক পর্যায়ে লক্ষ্য করা যায় যে, সরকারের প্রধান লক্ষ্য ছিল পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক পরিবেশ ও রাজনীতি উপহার দেয়া। সুনামখ্যাত বড় বড় রাজনীতিবিদ, সাবেক মন্ত্রী, আমলা এমনকি আওয়ামী লীগ ও বিএনপির প্রধান যথাক্রমে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকেও দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। সরকার নতুন রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার বিকল্প হিসেবে নতুন নেতৃত্ব গঠনের লক্ষ্যে রাজনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেয়। এ কৌশল পৃথিবীব্যাপী "মাইনাস টু ফর্মূলা" নামে পরিচিতি লাভ করে।[৮] তবে এ ফর্মূলা বাস্তবায়নে সরকার ব্যর্থ হয়।

এক পর্যায়ে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মইন-উ-আহমেদ নিজস্ব ব্র্যান্ডের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন কিন্তু তা প্রচণ্ড সমালোচনার মুখে পড়লে তিনি সরকারি ক্ষমতায় তার কোনো আগ্রহ নেই বলে প্রতিশ্রুতি দেন। তার পরপরই ২০ জানুয়ারি ২০০৮ সালে এক টেলিভিশন সাক্ষাতকারে মইন-উ-আহমেদ সামরিক ক্ষমতা দখলের অনাগ্রহ ব্যক্ত করে বলেন যে, এ পদ্ধতি বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়।[৯]

এ সময়ে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতি এক গভীর সংকটে নিমজ্জিত হয়। ১৫ বছরের নিয়মিত নির্বাচনী কৃষ্টি পুনরায় গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। তবুও পাকিস্তানের মতো সরাসরি সামরিক ক্ষমতা সৃষ্টি না হয়ে নতুন মডেলে সামরিক সমর্থিত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের রূপরেখা সৃষ্টি হয়। সরকার দুর্নীতি-বিরোধী অভিযানে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে যদিও তা আইনী ধীরগতির কারণে ব্যাপকভাবে বাধাগ্রস্থ হয়।

কিভাবে এবং কখন বাংলাদেশে একটি নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশ তৈরী হবে এবং গণতন্ত্রের মূল উপাদান বিশেষ করে মৌলিক স্বাধীনতা, আইনের শাসন ও জবাবদিহিতা ফিরে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করবে তা বুঝা মুশকিল হয়। এভাবে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের পথে নানাবিধ বাধার সম্মুখীন হয়।

গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের জন্য কী কী শর্ত পূরণ করা জরুরী তা খুজে বের করার চেষ্টা করা হবে। কেন এবং কী অবস্থার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে এখনও গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে সক্ষম হয়নি তা অনুসন্ধান করাই এ প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য। গণতন্ত্রের চ্যালেঞ্জসমূহ খুঁজে বের করার জন্য কতিপয় গণতান্ত্রিক উপাদান বা নির্দেশকের আলোকে আলোচনা করা হবে। মূলত চারটি নির্দেশকের ভিত্তিতে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মূল্যায়ন স্থান দেয়া হয়েছে। প্রথমতঃ অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন, দ্বিতীয়তঃ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, তৃতীয়তঃ মৌলিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা ও চতুর্থতঃ জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং সর্বপোরি বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সম্ভাবনার যুক্তি প্রদর্শিত হবে।

গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য সংগ্রহের কৌশল

এ প্রবন্ধটি সম্পাদনের জন্য মূলত দু'টি গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। যথাঃ ১. পর্যবেক্ষণমূলক পদ্ধতি ও ২. ঐতিহাসিক পদ্ধতি। এখানে মূলত প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ গবেষণা কর্মের জন্য সরকারি অধ্যাদেশ, বিজ্ঞপ্তি, গেজেট বিবরণী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, দৈনিক পত্রিকা, বাংলাদেশের রাজনীতির ওপর প্রকাশিত প্রবন্ধ এবং গ্রন্থের সাহায্য নেয়া হয়েছে।

গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণঃ তত্ত্বগত বিশ্লেষণ

ফ্রিডম হাউজের মতে বিশ্বের ১৯৩টি রাষ্ট্রের মধ্যে ১২২টি রাষ্ট্র বিগত অর্ধশতাব্দীর বেশী সময় ধরে নির্বাচনী গণতন্ত্রের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনে অঙ্গীকারবদ্ধ।[১০] দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ রাষ্ট্রই এ পদ্ধতি অনুসরণ করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। গণতন্ত্রের এই প্রসারতার মধ্যদিয়ে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে অনেকেই স্বাগত জানিয়েছেন। বিভিন্ন মনীষী গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে ভিন্ন ভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। Larry Diamond and M.F. Plattner উদারনৈতিক গণতন্ত্রের জন্য ৫টি শর্তের কথা উল্লেখ করেন, যথাঃ মৌলিক স্বাধীনতা, আইনের শাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা এবং অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা, এছাড়াও অবাধ গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, সিভিল সোসাইটির মতামতসহ সামরিক বাহিনীর ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে পারে।[১১] Robert Dahl গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য কতিপয় শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা- ১) সংগঠন করা এবং সংগঠনে

যোগদানের স্বাধীনতা, ২) ভোটাধিকার, ৩) মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, ৪) রাজনৈতিক নেতাদের সমর্থক ও ভোটারদের জন্য প্রতিযোগিতার অধিকার, ৫) তথ্যের বিকল্প উৎস, ৬) অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন।[১২] কাজেই আলোচনার ভিত্তিতে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের নিম্নলিখিত শর্তসমূহ উল্লেখ করা যেতে পারে। শর্তগুলো হলো- ১) অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন, ২) আইনের শাসন, ৩) নাগরিক মৌলিক স্বাধীনতা এবং ৪) জবাবদিহিতা। প্রথম নির্দেশকটি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম এবং প্রধান ভিত্তি যেহুতু জনগণ নিজের মত প্রার্থী পছন্দ করতে পারে যে, কে সরকারি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবেন। তবে এই শর্তটি অর্থহীন হয়ে যায় যদি গণতন্ত্রের অন্যায্য শর্ত পূরণ না হয়। দ্বিতীয় নির্দেশকটিও গণতন্ত্রের জন্য অন্যতম, কারণ জনগণের স্বাধীনতা রয়েছে কথা বলা, চলাফেরা ও প্রার্থী পছন্দ করা, তা না হলে গণতন্ত্রের মূল চেতনা বাস্তবায়িত হবে না। শেষ শর্তটি ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ সরকার জবাবদিহিতার মধ্যে ক্ষমতা ব্যবহার করলে স্বৈরাচারী আচরণ করতে পারবে না।

১. অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের চ্যালেঞ্জসমূহ

গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচিত হয় অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন । যদি জনপ্রতিনিধিরা জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলক হিসেবে যথাযথভাবে নির্বাচিত না হয়ে আসে তাহলে ওঐ প্রতিনিধিদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড কার্যকর হতে পারে না। আর নির্বাচনই যদি প্রশ্নাবধোক হয় তাহলে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কর্তৃত্বই প্রশ্নবোধক হয়ে দাঁড়াবে এমনকি সরকারি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তা দূর্বলতার প্রকাশ ঘটাবে। এক্ষেত্রে সরকার সত্যিকার ও গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ক্ষমতাসীন হলে বলিষ্ঠ সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণসহ যেকোনো কর্মকাণ্ডে দ্বিধা করবে না। এমনকি সেই পদক্ষেপ জনপ্রিয় না হলেও সামগ্রিকভাবে তা গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে। নির্বাচন যদি সুন্দর ও অবাধ হয় এবং জনগণ যদি অবৈধ প্রভাব বা উস্কানির শিকার না হয়ে স্বাধীনভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন এবং নির্বাচন কমিশন যদি রাজনৈতিক কর্তৃত্বের অজ্ঞাবাহী না হয়ে স্বাধীনভাবে নির্বাচনী প্রশাসনযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে নির্বাচন পরিচালনা করতে পারে তাহলে মূলধারার আমলাসহ গোটা জাতীয় সংসদ জনগণের সার্বভৌমত্বের প্রতিফলক একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে।[১৩] কাজেই নির্বাচনের অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য প্রক্রিয়ায় জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণই কেবল জাতীয় পর্যায়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সুনির্দিষ্ট নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারে। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর কখনোই পরিপূর্ণ স্বাধীন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচন কমিশন কাজ করতে পারেনি।[১৪] ১৯৭৩, ১৯৭৯, ১৯৮৬ এবং ১৯৮৮ সালের সাধারণ নির্বাচনগুলোতে নর্বাচন কমিশনের পরিবর্তে সবরকমের নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করেছে সরকার।

দীর্ঘ ১৫ বছরের সামরিক শাসনের অবসানের পর গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাংলাদেশে পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট তৈরী হয়। সামরিক শাসনের অধীনে বিভিন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও

সেগুলো প্রকৃত অর্থে নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন ছিল না। যার ফলে জনগণের মধ্যে নির্বাচনের ক্ষেত্রে বড় ধরনের আস্থা প্রতিষ্ঠা করা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে বিবেচিত হয়। ১৯৯০ সালে এরশাদ সরকারের পতনের পর জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার ফলস্বরূপ নিরপেক্ষ নির্বাচনের তাগিদে নির্দলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়। সামরিক শাসনের সময়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোতে ব্যাপক ভোট কারচুপির অভিজ্ঞতাই গণতন্ত্রের জন্য সৃষ্ট আন্দোলনের দাবি হিসেবে নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিবেচনায় আসে।

১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর প্রথমবারের মতো নির্বাচন কমিশনের অধীন একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার জাতির হাল ধরে। এভাবে জনগণের ভোটাধিকার পুনর্বহাল হয় এবং দেশে পুনরায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার যাত্রা শুরু হয়। ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় সংসদে সকলের নিরুঙ্কুশ সমর্থনে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপে সংবিধানের দ্বাদশতম সংশোধনী গৃহীত হবার মধ্য দিয়ে দেশে সংসদীয় ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন ঘটে। বিএনপি ক্ষমতাগ্রহণের তিন বছরের মধ্যেই আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জাতীয় সংসদে বিরোধীদলগুলো ভবিষ্যতে জাতীয় নির্বাচনগুলো নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠানের স্থায়ী বিধান সংবিধানের সংযোজনের দাবি জানানো হয়। এই দাবি ঘনিভূত করার প্রেক্ষাপটে সরকার ও বিরোধীদলের মধ্যে এক উত্তেজনাকর পরিবেশ তৈরী হয়। এভাবে বাংলাদেশে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুসংহতকরণে জাতীয় সংসদ ও বিরোধীদলগুলোর ভূমিকা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করে।

বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, বাংলাদেশে পর পর তিনটি নির্বাচিত সরকার গণতান্ত্রিক যাত্রাকে সুসংহত করেছে।[১৫] তবে নির্বাচিত সরকারের পরিবর্তে অনির্বাচিত ও অন্তর্বর্তী প্রকৃতির সরকারের অধীন নির্বাচন ঐক্যমত্যের জায়গা তৈরী হয়েছে। পঞ্চম সংসদের বিরোধী দলীয় সদস্যদের একযোগে পদত্যাগ, ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচনে শুধু ৫ম জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কর্তৃক অংশগ্রহণ এবং সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনী দ্বারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাশ বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক দুরত্বকে দীর্ঘায়িত করেছে। পরাজিত প্রধান প্রতিপক্ষ কর্তৃক নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিতে অনিহাজনিত প্রবণতা প্রতিটি নির্বাচনেই লক্ষ্য করা গেছে। ১৯৯১ থেকে পরবর্তী দু'দশক সময়ে এদেশে অনুষ্ঠিত প্রধান চারটি নির্বাচনে অর্থাৎ ১৯৯১, ১৯৯৬, ২০০১ এবং ২০০৮ সালের যথাক্রমে পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম সংসদ নির্বাচনে মূলত বিএনপি ও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়েছে এবং বাস্তবিক পক্ষে দ্বিদলীয় ব্যবস্থার নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেই থেকে বিএনপি ও আওয়ামী লীগ পরস্পর-বিরোধী অবস্থান নিয়েছে। তবে দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, তারা দেশে সুষ্ঠু ভূমিকা পালনকারী দলব্যবস্থা বা রাজনীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে প্রয়োজনীয় ও যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারেনি।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৯১ সালের নির্বাচনের পর তৎকালীন সরকারি দল বিএনপি ও প্রধান বিরোধীদল আওয়ামী লীগ সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার যে প্রত্যয় নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল তার যথাযথ সম্মান এ দল দুটো দিতে পারেনি। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সরকারি দলের উদাসিনতাও চরমভাবে ব্যত্যয় ঘটিয়েছে।

স্বাধীনতার পর বিগত প্রায় ৪১ বছরে বাংলাদেশে নয়টি সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে প্রথমটি আওয়ামী লীগের অধীনে, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থটি যথাক্রমে জেনারেল জিয়া ও এরশাদের সামরিক সরকারের অধীনে। কেবলমাত্র ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত খালেদা জিয়া সরকারের অধীনে। পঞ্চম, সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। আর সর্বশেষ নবম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ভিন্ন মডেলের সামরিক সমর্থিত অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে। তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও তা বিতর্কের ঊর্ধ্বে ওঠেনি। ১৯৯৬ সালে বিচারপতি হাবিবুর রহমান সরকার প্রধানের দায়িত্ব নেন। তখন বিএনপি নির্বাচিত আবদুর রহমান বিশ্বাস রাষ্টপতি। এ সরকারের মেয়াদে এক সেনা অভ্যুত্থানের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টার মধ্যে মতপার্থক্য স্পষ্ট হয়। নির্বাচন নিয়েও সংশয় তৈরি হয়। যদিও প্রধান উপদেষ্টার কঠোরতা ও সততার কারণে নির্বাচন সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু পরাজিত বিএনপি অভিযোগ করেছিল যে, ষড়যন্ত্র করে তাদের হারানো হয়েছে। সে সময় প্রধান উপদেষ্টা জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া এক টিভি ও বেতার ভাষণে বলেছিলেন, 'রাষ্ট্রপতি এমন কিছু পদক্ষেপ নিয়েছেন যা তার গোচরে নেই।' রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস তৎকালীন সেনাপ্রধানসহ কয়েকজন শীর্ষ সেনা কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়ার ঘটনা নিয়ে সরকার প্রধান ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল।

২০০১ সালের জুলাই মাসে আওয়ামী লীগ সরকার বিচারপতি লতিফুর রহমানের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। দায়িত্ব নিয়ে প্রথম রাতেই ১৩ সচিবকে একসঙ্গে বদলি করা হলে বির্তকের সূত্রপাত হয়। পরে ১৯৭২ সালের গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ সংশোধন করে আইন-শৃংখলা বাহিনীর সংজ্ঞায় প্রতিরক্ষা বাহিনীকে অন্তর্ভূক্ত করা নিয়ে বির্তক তৈরি হয়। এর ফলে সে সময় সারাদেশে নির্বাচনের আগে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়। আওয়ামী লীগ সে সময় অভিযোগ করেছিল, সেনাবাহিনীর সদস্যরা অনেক জায়গায় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের অত্যাচার করেছে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ হেরে গিয়ে অভিযোগ করে স্থূল কারচুপিতে হারানো হয়েছে তাদের। ২০০৬ সালে তৃতীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন নিয়ে দেখা দেয় নানা নাটকীয়তা। বিচারপতি কে এম হাসানকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান করার জন্য বিচারপতিদের বয়স হঠাৎ দুই বছর বাড়ানো হয়- এই অভিযোগ করে আওয়ামী লীগ। পূর্বেই উল্লেখ করেছি দলটি কোনোক্রমেই বিচারপতি হাসানকে প্রধান উপদেষ্টা মেনে নিতে রাজি হয়নি। ফলে মহাজোট গঠন করে শুরু করে

আন্দোলন-সংগ্রাম।[১৬] পরবর্তীতে সামরিক সমর্থনে ফখরুদ্দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকার দুই বছর রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। অভিযোগ করা হয়- এ সময়েই সংস্কারের নামে দেশে বিরাজনীতিকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। বহু রাজনীতিক-ব্যবসায়ীকে কারারুদ্ধ করা হয়। অনেককে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়। বহু অধ্যাদেশ জারির মতো নীতি নির্ধারণী কাজকর্ম করা হয়। অনেক সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানেও নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য রদবদল করা হয়। বস্তুত কোনো তত্ত্বাবধায়ক সরকারই নিজেদের বির্তকের ঊর্ধ্বে রাখতে সক্ষম হননি।[১৭] বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত প্রায় সকল নির্বাচনেই নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলো খুজে পাওয়া যায়। যথা:

ক. ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে এক পক্ষ কর্তৃক অন্য পক্ষকে অথবা রাজনৈতিক দলগুলো কর্তৃক সাধারণ ভোটারদের ভীতি প্রদর্শন; খ. বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নির্বাচনকে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা; গ. জালভোট প্রদান অর্থাৎ একজনের ভোট অন্যজনের দেয়া; ঘ. ভোট গণনার ক্ষেত্রে কারচুপি ও অসৎ উপায় অবলম্বন করা; ঙ. ভোটকেন্দ্রে রাজনৈতিক দলগুলো কর্তৃক সন্ত্রাস ও সহিংসতা সৃষ্টি করা; চ. ব্যালট বাক্স ছিনতাই করা; ছ. ব্যালট পেপার ছিনতাই করা; জ. শক্তিশালী প্রতিপক্ষ কর্তৃক ভোট কেন্দ্র দখল করা; ঝ. মিডিয়া ক্যু'র মাধ্যমে নির্বাচনের ফলাফলকে প্রভাবিত করা; ঞ. কালোটাকার ছড়াছড়ি; ট. প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসার এবং বিরোধী প্রার্থীদের অপহরণ করা; ঠ. সংখ্যালঘুদের ভোটকেন্দ্রে যেতে বাধা দেয়া বা হুমকি প্রদান করা; ড. সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় প্রশাসনের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করে নির্বাচনকে কলুষিত করা এবং ঢ. সাধারণ জনগণের স্বত:স্ফূর্ত অংশগ্রহণকে দমিত করা।[১৮]

উপর্যুক্ত কারণগুলো ৯টি নির্বাচনেই কম বেশী লক্ষণীয়। তবে পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম ও নবম সংসদ নির্বাচন তুলনামূলকভাবে এসব দোষ-ত্রুটি থেকে অনেকটাই মুক্ত ছিল।

২. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পরপরই ১৯৭২ সালে সংসদীয় গণতন্ত্র, বহুদলীয় ব্যবস্থা এবং মৌলিক স্বাধীনতার বিধান রেখে সংবিধান প্রণীত হয়। কিন্তু তিন বছরের মধ্যেই সামরিক শাসনের কবলে পরে যা পরবর্তী ১৫ বছর পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান ছিল। সামরিক সরকারের অধীন সংবিধান স্থগিতাদেশ, মৌলিক অধিকার হরণ এবং বিচার বিভাগসহ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সকল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সরকারের অধীনেই বিদ্যমান থাকে। সামরিক শাসনের অবসান ঘটার পর ১৯৯১ সালে সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃযাত্রা শুরু হলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার আশা করা হয়।

পরবর্তীতে তিনটি নির্বাচিত সরকার মেয়াদপূর্ণ করলেও সামরিক শাসনের কবল থেকে পুরোপুরি বের হয়ে আসতে পারেনি। অন্যদিকে সামরিক শাসকদের যতই নির্বাচিত সরকার নিজেদের স্বার্থে রাষ্ট্রীয় যন্ত্র ব্যবহারের প্রয়াস চালায়। সরকার সিভিল প্রশাসন ও নিম্ন আদালতের সকল পর্যায়ে দলীয়করণ বহাল রাখলে দুর্নীতি ব্যাপকতা লাভ করে।[১৯] বিভিন্ন বিশ্ব সংস্থার জরিপে আইনের শাসনের অবস্থাকে অত্যন্ত নগন্য বলে আখ্যায়িত করা হয়।

উদাহরণস্বরূপ, ফ্রিডম হাউসের জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশে ২০০৫ সালে স্কোর ছিল ৩.৪, যেখানে সম্ভাব্য স্কোর হওয়া দরকার ৭.০০। ২০০৭ সালে এই স্কোরটি গিয়ে দাঁড়ায় ২.৭।[২০]

২.১ বিচারবিভাগ

এরশাদ সরকারের পতনের পর ১৯৯১ সালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রত্যাশা করা হয়। তবে এ সময় পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার পুনঃপ্রবর্তিত হলেও বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণের বিল পঞ্চম সংসদে পাস করা হয়নি। কাজেই বিচারপতি নিয়োগদানসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নির্বাহীর প্রভাবমুক্ত থাকতে পারেনি। দেশে বিচার বিভাগের নানা সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের কাছে এই প্রতিষ্ঠানটির বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। দেশের রাজনৈতিক সংকটে রাজনীতিবিদগণও বিচার বিভাগের দ্বারস্থ হয়েছেন। ১৯৯১ এবং ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নেতৃত্ব দিয়েছেন দু'জন প্রধান বিচারপতি। ২০০১ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারেরও নেতৃত্ব দেন আবার একজন সাবেক প্রধান বিচারপতি। তাঁদের নিরপেক্ষতাও প্রশংসিত হয়েছে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানের পৃথকীকরণ প্রয়োজন খুব বেশী।

দেশের যেকোনো আইনী ব্যবস্থাতে বিচার কার্যের অদক্ষতা, অকার্যকারিতা ও দীর্ঘসূত্রিতা বিচার বিভাগকে পেছনে ফেলে দেয়। বাংলাদেশে নিম্ন আদালতের বিচার কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক নেতাদের মাধ্যমে প্রভাবিত। বিশেষ করে নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি প্রভৃতির মাধ্যমে বিচারক ও ম্যাজিস্ট্রেটরা প্রত্যক্ষভাবে সরকারি নিয়ন্ত্রণে তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। সরকারি কৌশলীগণ শাসকদল কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত। যার ফলে তারা কখনোই নিরপেক্ষ অবস্থান নিতে পারে না।

উচ্চ আদালত হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগের সমন্বয়ে সুপ্রিম কোর্ট ঐতিহাসিকভাবে স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ হলেও ইদানীং উচ্চ আদালতের নিয়োগ রাজনৈতিভাবে প্রভাবিত ও বিতর্কিত। যেমন ২০০৪ সালে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে হাইকোর্টে ১৯ জন বিচারক নিয়োগ দেয়া হয়।[২১] কিন্তু প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন এদের পেশাগতভাবে অযোগ্যতা ও মনোন্নয়নের দিক থেকে ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত বলে অভিযোগ আনে। সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন সরকার ও প্রধান বিচারপতি উভয়ের কাছেই আবেদন জানান তাদের বেশিরভাগকে সরানোর। যথাযথ সমর্থন না পেয়ে সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন আদালত থেকে বয়কট করে। তাছাড়া আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর ফলে প্রধান বিচারপতি পদটি রাজনৈতিক বিবেচনাধীন বিষয়ে পরিণত হয়েছে কারণ সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হবেন পরবর্তী তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। যদিও ২০১১ সালের মাঝামাঝিতে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিধানকে বিলুপ্ত করা হয়েছে।[২২]

যদিও আওয়ামী লীগ ও বিএনপি উভয় দলই বিচার বিভাগকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ করার ক্ষেত্রে প্রতিশুতিবদ্ধ হয় বিশেষ করে নির্বাচনী প্রচারণায়। চূড়ান্তভাবে সামরিক সমর্থিত ফখরুদ্দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারে উদ্যোগে ১ নভেম্বর ২০০৭ সালে বিচারবিভাগ নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করা হয়।[২৩] এতে নিম্ন আদালত সম্পূর্নভাবে উচ্চ আদালতের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।[২৪] তবে নিম্ন আদালতের একটি অংশ অর্থাৎ মেজিস্ট্রেটরা নির্বাহী বিভাগের অধীনে চলে যায়। এভাবেই বিচার বিভাগ সবসময়ের জন্য সরকার কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে আসছে যা গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

২.২ সিভিল ও পুলিশ প্রশাসন

গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অন্যতম উপাদান হচ্ছে একটি সুস্থ জনমুখী প্রশাসন। সাধারণভাবে প্রশাসন বলতে বেসামরিক আমলাবর্গের দ্বারা রাষ্ট্রীয় কার্যাদির পরিচালন ব্যবস্থাকে বুঝায়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক নেতৃত্ব সরকারি নীতি নির্ধারণ করেন, আর প্রশাসন তথা আমলাবর্গের দায়িত্ব হল সেই নীতি বাস্তবায়ন করা। প্রাতিষ্ঠানিকীরণের জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক ও আমলাদের মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক। উভয়ই নিজ নিজ পরিসীমার মধ্যে থেকে দায়িত্ব পালন করবেন। আমলারা যেমন নিষ্ঠার সঙ্গে সরকারের নীতি কার্যকর করবেন, রাজনীতিকরা তেমনি দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না। সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতির মধ্য থেকে মেধা ও দক্ষতার ভিত্তিতে সরকারি কর্মচারিদের নিয়োগ, পদোন্নতি ইত্যাদি হওয়া প্রয়োজন যাতে জনকল্যাণ ও উন্নয়ন সাধিত হয়।।

গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারগুলোর অধীনে দিনে দিনে প্রশাসনে রাজনীতিকরণের মাত্রা অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পাচ্ছে,[২৫] যদিও নীতিগতভাবে সরকারি প্রশাসনে মেধা ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয় তবে ইদানীং নিয়োগ ও পদোন্নতিতে চরমভাবে সরকারদলীয় রাজনীতিবিদদের নিয়ন্ত্রণে। সিনিয়র আমলাদের চাকুরীর মেয়াদবৃদ্ধি ও বাধ্যতামূলক অবসরের ভিত্তিতেও বিভিন্ন সময় আমলাদের নিয়ন্ত্রণ করা হয় এছাড়াও প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের নিয়োগেও পদোন্নতিতে দলীয় প্রভাব অধিক পরিমাণে বিদ্যমান।[২৬] সরকারি কর্ম কমিশন এক্ষেত্রে নানাভাবে দলীয়করণের সমালোচনায় পড়েছে। শাসক দলীয় ব্যক্তিরা কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যপদে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছেন। সাম্প্রতিককালে পিএসসি চোয়ারম্যান ও সদস্যদের নিরপেক্ষতা নিয়ে বিরোধীদল কর্তৃক নানাবিধ অভিযোগের খবর পাওয়া যায়। বিগত চারদলীয় জোটের আমলে পিএসসি সহ প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে দলীয়করণের নমুনা পাওয়া যায়।[২৭] ফলে পিএসসির সততা ও নিরপেক্ষতা এখন নানা প্রশ্নের সম্মুখীন। বিগত ফখরুদ্দীন আহমেদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার সংস্কারের নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও তা যথাযথভাবে শেষ করতে পারেনি।[২৮] উল্লেখ্য যে সব সরকারই নিজেদের পছন্দের লোককে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ উর্ধ্বতন পদে দেখতে চায়।

সচিবালয়ে পদোন্নতির ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব ও দলীয়করণের বহু অভিযোগ পাওয়া যায়। জোট সরকারের প্রথম সাড়ে চার বছরের প্রশাসনিক ক্যাডারের প্রায় ১৮০০ কর্মকর্তাকে পদোন্নতি

দেয়া হয়। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও প্রায় ৩০০ কর্মকর্তা পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হন। পদোন্নতির প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘিত হয়। আমলারা পদোন্নতি ও পছন্দমতো পদায়নের জন্য সরকারের অনুগ্রহ লাভের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হন।[২৯]

প্রশাসনে নিজেদের লোককে পুরস্কৃত করার জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়। চাকরির নিয়মিত মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে সরকারি কর্মকর্তাদের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিশেষ পয়োজনে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগদানের নিয়ম রয়েছে। কিন্তু আজকাল রাজনৈতিক বিবেচনায় এই নিয়মের। অপব্যবহার হচ্ছে এবং চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। ২০০০ সালে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগপ্রাপ্তদের সংখ্যা ছিল ৭৭ জন। ২০০৩ সালের আগস্টে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৪৫ জনে।[৩০] সরকারি হিসাব অনুসারে, জোট সরকারের প্রথম দুই বছরের ১৯৫ জনকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয়। এদের মধ্যে ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, ২৭ জন সচিব, ১১ জন অতিরিক্ত সচিব ও ১৫৭ জন অন্যান্য-কর্মকর্তা।[৩১] এভাবে প্রশাসনের প্রতি স্থরে পদোন্নতি, নিয়োগ এবং বদলিতে চরম বৈষম্যতা দেশের জনগণের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে যা গণতন্ত্রের পথে চরম বাধা।

পুলিশ প্রশাসনের প্রায় সবক্ষেত্রেই ঘুষ গ্রহণের প্রবনতা অধিক পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে। নিয়োগ, বদলী ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে রয়েছে চরম বৈষম্য যা গণতন্ত্রের মৌলিক শর্তের পরিপন্থি। পুলিশকে ঘুষ না দিলে মামলার ফাইল নড়ে না বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। সরকার নিজস্ব বাহিনী হিসেবে পুলিশকে ব্যবহার করে।

২.৩ সহিংসতা ও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা

বিগত তিনটি নির্বাচিত সরকারের সময়ে সহিংসতার মাত্রা পর্যবেক্ষণ করলে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অন্যতম বাধা হিসেবে এর মূল্যায়ন সম্ভব। বিশ্বব্যাংকের জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থা অত্যন্ত নিম্নমানের।[৩২] প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলকে কেন্দ্র নির্বাচনকেন্দ্রিক অর্থাৎ নির্বাচন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যে সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে তার পরিমান কম নয়। এ ধরনের সহিংসতার ঘটনায় শুধু উভয় দলের সমর্থকরাই খুন কিংবা জখমের শিকার হন না, এক্ষেত্রে দলের উচ্চ পর্যায়ে নেতারাও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। যেমন ২০০৪ সালের মে মাসে তৎকালীন বিরোধী দলের (আওয়ামী লীগ) নেতা ও সংসদ সদস্য আহসানুল্লাহ মাস্টার প্রকাশ্য জনসভায় বন্দুকধারীদের গুলিতে নিহত হয়।[৩৩] ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট রাজধানীতে এক পথসভায় বিভৎস গ্রেনেড হামলায় আওয়ামী লীগ নেতা আইভি রহমানসহ ২৩ জন নিহত ও শতাধিক আহত হন।[৩৪] আওয়ামী লীগের প্রধান শেখ হাসিনাও এই হামলায় আহত হন।[৩৫] ২০০৫ সালের ২৭ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ নেতা সাংসদ সাবেক অর্থমন্ত্রী কিবরিয়া তার নির্বাচনী এলাকা সিলেটে এক জনসভায় নিহত হন।[৩৬] এসব উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের হত্যাকাণ্ডের যথাযথ বিচার আজও বাংলাদেশের মাটিতে হয়নি।

১৯৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় ফিরে আসার পর তারা প্রথমেই যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন এরশাদের সাবেক মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে। তাদের প্রায় প্রত্যেককেই বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে কারারুদ্ধ করা হয়। এদের মধ্যে পাঁচ বছরেরও বেশি অন্তরীণ থাকা সাবেক রাষ্ট্রপতি এরশাদ ছাড়া আর কাউকে কোনো অপরাধে সাজা প্রদান করা হয়নি। পরবর্তীকালে, বিএনপি সরকার নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা থেকে অপসারিত হলে তারা সেই এরশাদের সঙ্গেই মিলে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হন। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ফিরে আসার পর কেবলমাত্র বেগম জিয়ার পরিবারবর্গ ও তার সাবেক মন্ত্রীদের বিরুদ্ধেই মামলা দায়ের করেনি, বরং বিশেষ ক্ষমতা আইন ও দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারা ব্যবহার করে সারা দেশের হাজার হাজার বিএনপি নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন।[৩৭]

রাজনৈতিক সহিংসতায় বর্তমান সরকারের তিন বছরে নিহত হয়েছে ৬০৬ জন। এর মধ্যে ২০০৯ সালে ২৫১ জন, ২০১০ সালে ২২০ জন এবং ২০১১ সালে ১৩৫ জন। শুধু ২০১১ সালে আওয়ামী লীগের ছাত্র ও যুব সংগঠনের ৯৮ জন এবং বিএনপির ১২ জন নিহত হয়েছে। ঘটনাগুলি ঘটেছে অর্ন্তদ্বন্দ্ব, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, ছাত্রবাসের আসন দখল, হল দখল ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে। বর্তমানে অত্যন্ত মারাত্মক দিকটি হলো আন্তর্জাতিক চাপের মুখে বিচার বর্হিভূত হত্যাকাণ্ড কিছুটা হ্রাস পেলেও সরকার এখন গুম, অপহরণ ও অন্যান্য পন্থা বেছে নিয়েছে বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন। গত তিন বছরে ৩৬৫ জন বিচার-বর্হিভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে। এর মধ্যে ২০০৯ সালে ১৫৪, ২০১০ সালে ১২৭ এবং ২০১১ সালে ৮৪ জন নিহত হয়। গণপিটুনিতে নিহত হয় ২০০৯ সালে ১২৭ জন, ২০১০ সালে ১৭৪ জন এবং ২০১১ সালে ১৬১ জন। বিচার-বর্হিভূত হত্যাকাণ্ডের পরিবর্তে, বিশেষ করে ক্রস ফায়ারের পরিবর্তে গুম করে দেবার ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর মধ্যে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরাও রয়েছেন। গত তিন বছরে ৫২৯ জন সাংবাদিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, বিশেষ করে সরকারের অপকর্ম প্রকাশের কারণে। ২০১১ সালে সীমান্তে ভারতীয় বিএসএফ কর্তৃক নিহত হয়েছে ৩৫ জন।[৩৮] ২০১১ সালের মানবাধিকার পরিস্থিতির বিবরণ দিতে গিয়ে অধিকারের মতে গত তিন বছরের যৌতুকের কারণে নারী নির্যাতন বেড়েছে। ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ১২১৩ জন। সবচেয়ে বেশি নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ২০১১ সালে। এই সংখ্যা ৫১৬ জন। ১৭২৬ জন নারী ও শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। এসিডদগ্ধ হয়েছে ৩৩৯ জন নারী। অন্যদিকে কারগারে মৃত্যুবরণ করেছেন ২১৫ জন। নির্বাচিত সরকার গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হলে এবং শৃঙ্খলা রক্ষাকারীরা দায়িত্বশীল হলে এত জন ব্যক্তিকে এমন নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করে মৃত্যুবরণ করতে হতো না।

দেশের বড় বড় রাজনীতিবিদ, সাবেক মন্ত্রী, সাংসদ, বিরোধীদলীয় নেতৃবৃন্দসহ সাধারণ মানুষের বিভিন্ন সহিংসতায় নিহত হওয়ার ঘটনা এতই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, স্বাধীন মত প্রকাশ, চলাফেরা কোনোটাই নিশ্চিন্ত নয় যা গণতন্ত্রের পথে বাধা।[৩৯]

২.৪ দুর্নীতি

১৯৯০ পরবর্তী গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার আসায় পর বাংলাদেশে দুর্নীতির চিত্র উল্লেখযোগ্যভাবে অবনতি ঘটে। খালেদা জিয়া সরকার (১৯৯১-৯৫) দুর্নীতিরোধে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়। এ সরকারের সময় ১৯৯৬ সালে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল প্রকাশিত দুর্নীতির ধারণাসূচকে বাংলাদেশকে চতুর্থ সর্বাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। পরবর্তীতে শেখ হাসিনা সরকারের সময়ও (১৯৯৬-২০০১) দুর্নীতি পরিস্থিতি আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৪০] দুর্নীতি পরিস্থিতি এতটা আশংকাজনক হয়ে ওঠে যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সংসদে দুর্নীতিকে 'কালব্যাধি' আখ্যা দিয়ে 'ঘুষ না দিলে প্রধানমন্ত্রীর চাকরির সুপারিশও কার্যকরী হয় না', 'ফুয়েল না দিলে ফাইল নড়ে না', 'দুর্নীতির মামলা কোর্টে গেলে সহজে আর আলোর মুখ দেখে না', প্রভৃতি মন্তব্য করেন।[৪১] বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর দুর্নীতিকে বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে অন্যতম অন্তরায় হিসাবে উল্লেখ করেন। ২০০১ সালে *ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল* এর দুর্নীতির ধারণাসূচকে বাংলাদেশকে প্রথম বারের মত সর্বাধিক দুর্নীতযুক্ত দেশ হিসাবে আখ্যায়িত করে। এ ঘটনাটি সারা বিশ্বে বাংলাাদেশের দুর্নীতি বৃদ্ধির বিষয়টিকে পরিচিত করে তোলে।

অষ্টম সংসদ নির্বাচনে বিএনপি এর নির্বাচনী ইশতেহারে দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনের অঙ্গীকার করে দুর্নীতি দমনের লক্ষ্যে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ন্যায়পাল গঠন, স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন, মানবাধিকার কমিশন গঠন, এবং প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীসভার সদস্যবর্গ এবং সম-পর্যায়ের সকলের সম্পত্তির হিসাব গ্রহণ ও প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতি দিলেও কিন্তু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে চারদলীয় জোট সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি মোতাবেক কোনো উদ্যোগ নেয়নি।[৪২] কিন্তু বুদ্ধিজীবী ও সিভিল সমাজের চাপে এবং বিশেষ করে দাতাদের অব্যাহত চাপে অনেক দেরীতে হলেও সরকার ২০০৪ সালে সংসদে দুর্নীতি দমন কমিশন বিল পাশ করে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করে।[৪৩] কমিশন গঠন করলেও তা কার্যকরী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়নি। টিআইবি কর্তৃক ২০০৪ সালে পরিচালিত খানা জরিপে দেখা যায় ৯টি খাতের ২৮টি সেবা নিতে জনগণকে বছরে আনুমানিক ৬ হাজার ৭শ' ৯৬ কোটি টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিটি বাংলাদেশী মানুষকে বছরে গড়ে ৪শ' ৮৫ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে। এর মধ্যে ভূমি সংশ্লিষ্ট অফিস, থানা এবং নিম্ন আদালতের সাথে সংশ্লিষ্টরা সবচেয়ে বেশি পরিমাণে ঘুষ সংগ্রহ করেছে।[৪৪]

বর্তমানে বাংলাদেশের এক শ্রেণীর লুটেরা রাজনীতিবিদ এবং দুর্নীতিবাজ আমলা ও পেশাজীবীদের দৌরাত্নে বাংলাদেশের সকল ক্ষেত্রে দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা নিজের স্বার্থে ভবহার করে সরকারি বিভিন্ন ক্রয়ে অতিরিক্ত মূল্য দেখিয়ে অর্থ আত্মসাৎ, ঘুষ বা কমিশনের বিনিময়ে বিদেশী কোম্পানিগুলোকে ব্যবসা করার সুযোগ প্রদান, সিন্ডিকেটের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে অর্থ উপার্জন, সরকারি পণ্য ক্রয়ের মাধ্যমে বরাদ্দকৃত অর্থের পূর্ণ ব্যবহার না করে আত্মসাৎ, বিভিন্ন সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যেমনঃ পাসপোর্ট,

পুলিশ, বিদ্যুৎ, গ্যাস, টেলিফোন ও অন্যান্য খাতে ঘুষের লেনদেন, অতিরিক্ত মুনাফা আদায়, খাদ্য ও অন্যান্য উপকরণে ভেজাল দ্রব্য মেশানো, শেয়ার কেলেংকারী ও বিভিন্ন সরকারি কাজে দালালদের দৌরাত্মসহ সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। Transperancy International Bangladesh কর্তৃক পরিচালিত দুর্নীতির জরিপ ২০০৫ অনুযায়ী, বাংলাদেশের ১০টি খাতের ২৫টি সেবা নিতে প্রায় ৭০ শতাংশ লোক ঘুষ প্রদান করেছে।[৪৫] অন্যদিকে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স স্টাডিজ (IGS) কর্তৃক ২০০৭ সালের তথ্য দিয়ে পরিচালিত দি স্টেট অব গভর্নেন্স-এ দেখা যায় বিদ্যুৎ, পুলিশ ও কাস্টমস্ বিভাগ সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত এবং ২০০৭ সালে জনগণের কাছে রাজনীতিবিদরা সবচেয়ে অবিশ্বাসী ছিলেন। অবশ্য পুলিশ ও স্থানীয় সরকার প্রশাসন পরের স্থান দখল করেছে।[৪৬] একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, বিগত ৩৫ বছরে বাংলাদেশে ৫০-৬০ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে।[৪৭] তবে একথা সত্য যে দুর্নীতির এ ভয়াল দানব একদিনে সৃষ্টি হয় নি। বিভিন্ন নেতিবাচক নীতি ও অদূরদর্শিতায় দুর্নীতির এ দানব আমাদের ঘাড়ে চেপে বসেছিল। এহেন অবস্থায়, গত ১১ জানুয়ারি, ২০০৭ সালে বিগত অন্তর্বর্তীকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনভাবে কাজ শুরু করে। তথাপি এক গবেষণা মতে, ২০০৬-২০০৭ সালে বাংলাদেশের ৬৬.৭ শতাংশ থানা কোনো না কোনো দুর্নীতির শিকার হয়েছে।[৪৮] দুর্নীতির বর্তমান অবস্থা পরিমাপ করার জন্য টিআইবি ২০০৭ সালে আবার একটি খানা জরিপ পরিচালনা করে।

প্রশাসনের প্রতিটি রন্ধ্রে এমনভাবে দুর্নীতি জেঁকে বসেছে যে তার মুলোৎপাটন ছাড়া জনগণের স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা সম্ভব না। দুর্নীতির পরিমান না কমলে কোনো কাজই স্বচ্ছতার সাথে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

৩. সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠা

গণতন্ত্র সুসংহত ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে অন্যতম শর্ত হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কার্যকরী এবং স্বাধীন সমাজ প্রতিষ্ঠা। সিভিল সমাজ উদারনৈতিক গণতন্ত্রের জন্য আবশ্যক।[৪৯] গণতন্ত্র বিষয়ে তাত্ত্বিক ল্যারি ডায়মন্ড মন্তব্য করেন যে শক্তিশালী সিভিল সমাজ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় শুধু দায়িত্বশীলতাই নিশ্চিত করে না, গণতন্ত্রের প্রতিনিধিত্বশীলতাও প্রতিষ্ঠা করে। সিভিল সমাজ গণতন্ত্রের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সংযুক্তি সরবরাহ করে; রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ গণতান্ত্রিক উদ্যানে পরিণত হয়; সরকারি ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের স্বেচ্ছাচারমূলক ব্যবহার রহিত করে; কর্তৃত্বের বৈধতা আনয়ন করে; রাজনৈতিক চিন্তা, চেতনা, স্বার্থ, সচেতনতা, আস্থা, আত্মবিশ্বাস এবং নাগরিকের কর্মক্ষমতার প্রকাশ ঘটায়।[৫০] ঐতিহাসিক এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, শুধু বাংলাদেশে নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সিভিল সমাজ দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে আসছে। ভোটাধিকার, নাগরিক বৈষম্য, দাসপ্রথা, নারীর আর্থ-সামাজিক অধিকার, শিশুর অধিকার, সমাজের অনাচার, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, মৌলবাদ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সিভিল

সমাজ সোচ্চার হয়েছে এবং জনস্বার্থে এসব নিয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার জন্য রাষ্ট্র ও সরকারকে প্রভাবিত করেছে।[৫১]

বাংলাদেশে নব্বই এর অভ্যুত্থানে সিভিল সমাজ গণতন্ত্র উত্তরণে তথা রাজনৈতিক উন্নয়নে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখে এবং এই গণঅভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু সংখ্যক সিভিল সমাজের জন্ম হয়েছে এবং এগুলোর পর্যায়ক্রমিক সম্প্রসারণ ঘটেছে।[৫২] তবে ১৯৯১ পরবর্তী সময়ে সিভিল সমাজ অনেক ক্ষেত্রে বিতর্কিত ভূমিকা পালন করতে থাকে। সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও রাজনৈতিক দলের সমর্থন ও আশ্রয়কে কেন্দ্র করে সাস্কৃতিক গোষ্ঠী এবং জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা (জাসাস) সৃষ্টি হয়েছে। প্রথমটি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং দ্বিতীয়টি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করেছে। একাত্তরের স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তিকে নির্মূল করার জন্য বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে সংগঠিত হয়েছে ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি। ঘাতক-দালাল নির্মুল কমিটির কার্যক্রমকে সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী আন্তরিকভাবে সমর্থন দিলেও জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা (জাসাস) এ বিষয়ে কোনো স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করে না। আবার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলের আশ্রয়ে দুটি সিভিল সমাজ আবির্ভূত হয়েছে। এগুলো হলো একদিকে আওয়ামী লীগ সমর্থিত নাগরিক ফোরাম অপরদিকে বিএনপি সমর্থিত শতদল নাগরিক। অতএব আমরা লক্ষ্য করছি যে, সিভিল সমাজও কোনো কোনো বিষয়ে দলীয় স্বার্থের বেড়াজাল থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে।[৫৩] তবে কিছু সিভিল সমাজ যারা সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে সবসময়ই কথা বলার চেষ্টা করেছে। অনেক সময় স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে সিভিল সমাজকে সরকারের রোষানলেও পড়তে হয়।

৪. রাজনৈতিক অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিতা

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বলতে সরকারি নীতি নির্ধারণ, শাসন পরিচালনা ও রাজনৈতিক নেতা নির্বাচনকে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে পরিচালিত যেকোনো ক্রিয়াকে বুঝায়।[৫৪] সংসদয় গণতন্ত্রে সার্বজনীন ভোটাধিকার, রাজনৈতিক সংগঠন, সমাবেশ, প্রচারণা ইত্যাদি অংশগ্রহণের প্রধান হাতিয়ার। বাংলাদেশে সাংবিধানিকভাবে এসব অধিকার স্বীকৃত। কিন্তু কার্যত সে অধিকার প্রয়োগ নানাভাবে বাধাগ্রস্ত। পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, এ যাবৎ অনুষ্ঠিত অধিকাংশ নির্বাচনই বিভিন্ন দোষে দুষ্ট। অপপ্রচার, কালো টাকা ও পেশি শক্তির ব্যবহার এসব নির্বাচনকে এতটাই কলুষিত করে যে, সে গুলোতে জনমতের প্রতিফলন কতটুকু ঘটেছে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। পাঁচ বছর অন্তর অনুষ্ঠিত নির্বাচন ভোটারদের নিকট শাসকদের জবাবদিহিতা কার্যকর প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে উঠতে পারেনি। আমাদের সংবিধানের বিধান মতে নির্বাহী বিভাগ সংসদের নিকট দায়বদ্ধ। কিন্তু এই দায়বদ্ধতাও প্রহসনে পরিণত হয়েছে। সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সরকার দলীয় সংসদ-সদস্যদেরকে প্রধানমন্ত্রীর বশংবদে পরিণত করেছে। স্পিকার সরকারের অঙ্গুলি হেলনে বিরোধী দলীয় সদস্যদের কথা বলার পর্যাপ্ত

সুযোগ দেন না। এমনকি তিনি 'ব্যর্থ সরকার','সরকারের পদত্যাগ দাবি' ইত্যাদি মামুলি কথাকে অসংসদীয় বলে 'এক্সপাঞ্জ' করে দেন। আবার বিরোধী দল নানা অভিযোগ তুলে বছরের পর বছর সংসদ বর্জন করে সরকারকে ফাঁকা মাঠে গোল দেয়ার সুযোগ করে দেয়। নির্বাচিত সরকার হয়ে ওঠে স্বৈরাচারী। সংবাদ মাধ্যমে সংসদ হয়ে পড়ে গুরুত্বহীন। এক সময়ে জাতীয় পত্রিকাগুলো সংসদের দৈনিক কার্যবাহের সারসংক্ষেপ নিয়মিত প্রকাশ করতো। বর্তমানে সংসদ যেমন নিয়ম রক্ষার জন্য অধিবেশনে বসে তেমনি সংবাদপত্রগুলো মাঝে মধ্যে চমক সৃষ্টিকারী কিছু ঘটনা প্রকাশ করে সংসদের অস্তিত্ব জানান দেয়।

সংসদের বাইরে বিভিন্ন সংগঠন সাধারণত হরতাল, সভা-সমাবেশ, বিক্ষোভ, মিছিল, ঘেরাও, অবরোধ ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের দাবিদাওয়া ও অভিযোগ তুলে ধরে। কিন্তু সরকার এ ধরনের শান্তিপূর্ণ কার্যকলাপও বরদাস্ত করতে চায় না। বরং বিরোধী দলের ওপর দমন-নিপীড়ন চালায়। যত দিন যাচ্ছে তত দমন-নিপীড়নের মাত্রা বাড়ছে।

বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতি পুনরুজ্জীবনের পর গত দু'দশক কেটে গেলেও গণতন্ত্রিক ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে পারেনি। বিগত সময়সহ বর্তমানেও বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র একের পর এক সংকটের সম্মূখীন হয়। সংসদীয় গণতন্ত্রকে মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ ব্যর্থতার মূলে ছিল জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে সক্ষমভাবে টিকিয়ে রাখার অপারগতা, সংসদীয় গণতন্ত্রের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান জাতীয় সংসদ জাতীয় সংসদ তার সাংবিধানিক নির্দিষ্ট ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। জাতীয় সংসদে গুরুত্বপূর্ণ অভিভাবক হিসেবে স্পিকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন, বিরোধী দলের সংসদ বর্জন, এবং সংসদ নির্বাচন নিয়ে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা সুনির্দিষ্টভাবে সংসদীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে বাধাগ্রস্থ করেছে যা বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে চরম প্রতিবন্ধকতা হিসেবে চিহ্নিত হয়। আজকাল রাজনৈতিক দলগুলো তাদের আন্দোলনের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে হরতালকে ঘন ঘন ব্যবহার করছে এবং তা ক্রমশ বেড়েই চলেছে।[৫৫] হরতালের নামে হরতালের পূর্ব দিন দেশে যে বোমাবাজি ও গাড়ী পোড়ানোর সংস্কৃতি শুরু হয়েছে তা রোধ করতে না পারলে সাধারণ মানুষের স্বাধীন চলাফেরা চরমভাবে ব্যাহত হবে।[৫৬]

জনগণের দাবিদাওয়া ও প্রতিবাদ জানানোর অন্যতম বাহন হল গণমাধ্যম। বেসরকারি ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় গণসংগঠন ও বিরোধী দলে কথা মোটামুটি প্রচার পেলেও রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম সরকারি দলের প্রচারযন্ত্রে পরিণত হয়েছে। মানবাধিকার সংস্থা 'ডেমেক্রেসি ওয়াচ'-এর তথ্য (জানুয়ারি-জুন, ২০০০) অনুযায়ী বাংলাদেশ টেলিভিশনের (বিটিভি) খবরে সরকারি দলের কাভারেজ থাকে ৯৯% জুড়ে, আর বিরোধী দলের ১%। জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বিটিভি অনেক খবর প্রচার করেনি।[৫৭] বর্তমান সরকার একই নীতি অধিকতর নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছে। তবে সবচেয়ে ভয়াবহ প্রবণতা হল সাংবাদিক সম্প্রদায়ের প্রতি ক্ষমতাসীনদের অসহিষ্ণু ও নিপীড়নমূলক আচরণ। তাঁরা

নিজেদের ব্যর্থতা বা দুর্নীতির কথা স্বীকার করতে চান না। বরং সেসব কথা মিডিয়ায় প্রচারিত হলে দেশের 'ভাবমূর্তি' ক্ষুণ্ন করার জন্য সাংবাদিকদের ওপর দোষারোপ করেন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা করেন না। পূর্ববর্তী সকল শাসনামলে কয়েকজন সাংবাদিক নিগৃহীত হন। সম্প্রতি সাংবাদিক নির্যাতনের মাত্রা বহু গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্যারিস ভিত্তিক আন্তর্জাতিক মিডিয়া সংগঠন "Reporters Without Borders"-এর ২০০৫ সালের রিপোর্টে বলা হয়, 'রক্ষণশীল ও ইসলামবাদী দল সমবায়ে গঠিত প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জোট সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের কথা অস্বীকার করে অপরাধীসুলভ আচরণ প্রদর্শন করেছে।' এই রিপোর্ট অনুসারে ২০০৪ সালে বাংলাদেশে ৪ জন সাংবাদিক নিহত, ৯৬ জন দৈহিকভাবে আক্রান্ত ও ৯ জন গ্রেপ্তার হন, ১৭৪ জনকে ভীতি প্রদর্শন করা হয় এবং ৯টি মিডিয়া অঙ্গন ভাঙচুর হয়। International Federation of Journalists তার ২০০৫ সালের রিপোর্টে বলে, সাংবাদিকদের দায়িত্ব পালনের জন্য দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশ সবচেয়ে বিপজ্জনক স্থান।[৫৮]

সাংবাদিকদের ওপর নির্যাতনের ঘটনা একের পর এক ঘটে যাচ্ছে কখনো অচেনা সন্ত্রাসীরা কখনোবা পুলিশ এই নির্যাতনের অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশের মিডিয়া এখন ক্রমপ্রসারমান, মতপ্রকাশের স্বাধীনতাও এখানে অন্য অনেক দেশের তুলনায় মন্দ নয়। কিন্তু পেশা হিসেবে সাংবাদিকতা ক্রমশই ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ১৭৯টি দেশের ওপর পরিচালিত রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার-এর প্রেসের স্বাধীনতার সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান নিচের দিকে- ১২৯ তম। অন্যদিকে কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস-এর হিসেব অনুযায়ী ১৯৯২ হতে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের মোট ১৪ জন সাংবাদিক নিহত হয়েছেন সন্ত্রাসী আক্রমণের কারণে।

লক্ষ্য করার বিষয় হলো ১৪ জনের মধ্যে প্রথম ১২ জনই মফস্বলের সাংবাদিক ছিলেন। তাদের মধ্যে শামছুর রহমান, মানিক সাহা, হুমায়ুন কবীর বালু, প্রবীর শিকদার, গৌতম দাসসহ কয়েকটি নাম আমাদের মনে পড়িয়া যায়। স্থানীয় পর্যায়ে অপরাধবিষয়ক প্রতিবেদন রচনা করেই তাদের প্রাণ হারাতে হয়েছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে ঢাকাস্থ টেলিভিশন চ্যানেলের সাংবাদিক-দম্পতি হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি সর্বমহলে বহুলভাবে আলোচিত বিষয়ে পরিণত হয়। লক্ষ্য করার বিষয় হলো এসব হত্যাকাণ্ডের কোনোটিরই বিচার হয়নি, ৮টি ক্ষেত্রে আসামিরা দণ্ডমুক্ত হয়েছেন।

এদিকে পরপর কয়েকটি সাংবাদিক-নির্যাতনের ঘটনা ঘটয়ে পেশাগত-ঝুঁকির বিষয়টি রীতিমতো আতঙ্ক-উদ্বেগের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে প্রথম আলোর তিন আলোকচিত্রী পুলিশের হাতে নির্যাতিত হয়েছেন, যাদের হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিতে হয়েছে। নির্যাতনকারী এসআইকে রাঙ্গামাটিতে বদলি করার মতো 'মৃদু শাস্তি প্রদান করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এ ঘটনার পর সাংবাদিকদেরই পুলিশ হতে দূরে থোকে

দায়িত্ব পালনের পরামর্শ দিয়েছেন। আবার ধারালো অস্ত্র নিয়ে বিডিনিউজের অফিসে ঢুকে সাংবাদিকদের আক্রমণ করে বসে সন্ত্রাসীরা এবং তিনজন সাংবাদিককে গুরুতর আহত করে। বিডিনিউজের অফিসের মেঝে আহত সাংবাদিকের রক্তে রঙিন হয়ে ওঠে। পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করে যাদের একজন নিজেকে সরকারি দলের অঙ্গসংগঠন যুবলীগের কর্মী বলে পরিচয় দেয়। এই দুই ঘটনার কোনোটিতেই সাংবাদিকদের নির্যাতিত হবার মতো গুরুতর কোনো কারণ ছিল না। ২৯ মে ২০১২ তারিখে আদালত পাড়ায় পুলিশ কর্তৃক এক নারী শ্লীলতাহানির শিকার হওয়ার পর আক্রান্ত নারীর কাছ হতে তথ্য গ্রহণকালে *প্রথম আলোর* আদালত প্রতিবেদককে পুলিশ শারীরিকভাবে নির্যাতন করে।

নিজ বাসভবনে সাংবাদিক সাগর-রুনি দম্পতি হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন, নিজ অফিসে হামলায় আহত হয়েছেন বিডিনিউজের সাংবাদিকরা, দায়িত্বপালন করতে গিয়ে পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়েছেন প্রথম আলোর সাংবাদিকেরা। সাংবাদিকদের যদি পেশাগত কারণে বাড়তি গুরুত্ব নাও দেয়া হয় এই বিবেচনায় যে, পুলিশ সব পেশার মানুষকেই নির্যাতন করে, সন্ত্রাসীরা সব স্তরের মানুষের ওপরই হামলা করে- কিন্তু আইনের শাসনের অনুপস্থিতি, ব্যক্তি- মানুষের মাঝে নৈতিকতার চরম অভাব, হিংসা-হানাহানি নিত্যকার বিষয়ে পরিণত হওয়ায় এই ধরণের ঘটনা ঘটে চলেছে। এ এক অরাজক পরিস্থিতি, সার্বিক সামাজিক অস্থিরতা-ব্যাধির একটি লক্ষণ। সামাজিক বৈষম্য হ্রাস এবং সর্বাঙ্গীন ন্যায়বিচার কায়েম করার মাধ্যমে এই ব্যাধি ধীরে ধীরে দূর করতে হবে।[৫৯]

সুপারিশমালা ও উপসংহার

বাংলাদেশে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হলেও নানা কারণে ১৯৭৫ সালের পর এ ব্যবস্থা টিকে থাকেনি এবং ১৯৯১ সালে সর্ব-সম্মত উপায়ে সংসদীয় গণতন্ত্র পুন:প্রতিষ্ঠিত হলেও এর প্রাতিষ্ঠানিকায়নের পূর্বশর্তগুলো পূরণ করা সম্ভব হয়নি। গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের অন্যতম শর্ত হিসেবে বিবেচিত বিষয়গুলো বাংলাদেশের রাজনৈতিক কাঠামোতে যথাযথভাবে ক্রিয়াশীল নয়, উপরোক্ত বিভিন্নমুখী তথ্য ও আলোচনার ভিত্তিতে সম্মত দৃশ্যমান হয় যে গণতন্ত্র কার্যকারিতার উপাদানগুলো কোনোভাবে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে না। যার ফলে দেশে গণতন্ত্রের অবক্ষয় প্রতিনিয়ত ঘটছে। কখন কিভাবে গণতন্ত্রের উজ্জ্বল সম্ভাবনা জাগ্রত হবে তা ধারণা করা খুবই মুশকিল। বাংলাদেশ কখন সকল দলের কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দিতে পারবে? আদৌ কী দেশে নিরপেক্ষ নির্বাচনের সংস্কৃতি গড়ে ওঠেছে? কিংবা পরবজিত দল নির্বাচনের ফলাফলকে কখন কিভাবে অভিনন্দিত করবে সে অপেক্ষা আমাদের সবারই।

১৯৯০ সালে ব্যাপক গণ-আন্দোলনের চাপের মুখে রাজনৈতিক দলগুলো গণতন্ত্র নিশ্চিতকরণে যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তার মধ্যে ছিল: কার্যকর সংসদ, জবাবদিহিমূলক সরকার, আইনের শাসন, অসংগতিপূর্ণ আইনসমূহ বাতিল করাসহ মৌলিক মানবাধিকার,

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার স্বায়ত্বশাসন, বিচারবিভাগের স্বাধীনতা। আজ দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও জবাবদিহিমূলক সরকার কিংবা গণতন্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক রূপের লক্ষে আইনের শাসন পেয়েছি কিনা তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। সাহসী যুবক নূর হোসেন বুকে "গণতন্ত্র মুক্তি পাক" ও পিঠে "স্বৈরাচার নিপাক যাক" লিখে আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন এবং গুলিতে নিহত হয়েছিলেন সেই স্বৈরাচারের পতন হলেও গণতন্ত্র এখনো মুক্তি পায়নি। রাজনীতিতে অস্ত্র, কালো অর্থ, নির্বাচনে পেশী শক্তির ব্যবহার জঙ্গিবাদের অনুপ্রবেশ কার্যকর হওয়ায় গণতন্ত্রের অগ্রগতি ব্যাপকভাবে আহত হয়েছে, এমনকি রাজনীতিও চরম অসুস্থতার কবলে পড়েছে। অসুস্থ রাজনীতি প্রতিশ্রুতিপূরণের মাধ্যমে জনগণের আস্থা অর্জনের প্রয়োজন অনুভব করেনি। তার বদলে তারা কালো টাকা ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে এমনকি নির্বাচনী কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে পক্ষে নিয়ে নির্বাচনে কারচুপি করার দু:স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে চেয়েছে যা কোনো কোনো সময় আংশিকভাবে সফল হয়েছে আবার কোনো সময় তার ব্যতিক্রম, রাজনৈতিক দলগুলো ক্রমেই মনোনয়ন বিক্রির প্রতিযোগিতায় নেমে সর্বোচ্চ দরদাতাকে মনোনয়ন দিচ্ছে। যারা মনোনয়ন কিনছে তাদের যোগ্যতা, জসেবার ইচ্ছা কিছু বিবেচনা করা হয়নি।

স্বৈরাচারী সরকারের মতোই দেশে দলীয়করণ সর্বগ্রাসী হয়ে ওঠেছে, ক্ষমতার ভারসম্য বিনষ্ট হচ্ছে এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহিতা ক্রমেই ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। রাষ্ট্র বন্দি হয়ে পড়েছে স্বার্থান্বেষী শিকারিদের হাতে। আমলাতন্ত্র ও আইনশৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনীগুলোর মধ্যে দলীয় আনুগত্য প্রবল হয়ে ওঠেছে যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তারা জনগণের কল্যাণের চেয়ে দুষ্ট রাজনীতিবিদদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। মাফিয়ারা রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকতায় চলে আসে এবং সন্ত্রাস ভয়াবহ রূপ নেয়। রুগ্ন রাজনীতির আরেকটি অন্যতম উপসর্গরূপে সশস্ত্র ক্যাডাররা বিভিন্ন এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করছে। শুধু তাই নয়, শিক্ষাধীনসহ অন্যান্য এলাকায় দলীয় আনুগত্য মেনে নিয়ে কাজ করতে হয় এবং দরিদ্র ও সাধারণ মানুষ, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নির্যাতন ও দমনে বাধ্য করা হয়। বিভিন্ন সময়ে রাজনীতিবিদরা নিজেদের রক্ষা ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অপপ্রয়োগ ও করেছে। সন্ত্রাসবাদকে লুকানো, তদন্ত বিলম্বিত করা এবং কার্যকর আইনশৃঙ্খলা বাস্তবায়নকে নিয়মিত ভাবে আহত করা হয়। নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালতের সকল পর্যায়ে দলীয় করণ ও রাজনীবিদদের প্রভাব বিচার প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করছে। বিচারকদের পদোন্নতি ও বিভিন্ন সুসাগ-সুবিধা প্রদানে সরকারি প্রভাব বিদ্যমান থাকায় বিচার বিভাগ তার নিরপেক্ষতা হারিয়ে ফেলছে।

প্রায় দু'দশকের এসব তিক্ত অভিজ্ঞতার পটভূমিতে গত ২০০৪ সালে সব গণতান্ত্রিক শক্তি প্রকৃত রাজনৈতিক ও নির্বাচনী সংস্কারের দাবিতে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হলেও তার যথাযথ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি, নির্বাচনী ও রাজনৈতিক সংস্কার আজ জাতীয় অগ্রাধিকারে পরিণত

হয়েছে। এই অধিকারের বাস্তবায়ন কেবল একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনই নয়, বরং গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সাহায্য করবে।

জনগণের আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বার্থ ও চাহিদাকে নীতিতে পর্যবসিত করে গণতন্ত্র শক্তিশালীকরণে জাতীয় সম্পদের যে মুখ্য ভূমিকা পালনের কথা তা আদৌ বাস্তবায়িত হচ্ছে না। নির্বাচিত সংসদের কার্যক্রম শুরুর সময় থেকেই ওয়াক আউট, বয়কটের রাজনীতির প্রবনতা অধীক পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছে।

শুধু তাই নয় জনগণের নয় বরং নেতাদের স্বার্থে সামান্যতম ব্যাঘাত ঘটলে দলত্যাগ প্রবনতা ও দলীয় ইচ্ছাধীনে থাকতে হয় এবং সংবিধানের ৭০ নং অনুচ্ছেদের কারণে সংসদীয় কাঠামোতে স্বাধীনভাবে বিকল্প পন্থা অবলম্বন সম্ভবপর হয় না, এছাড়াও জাতীয় সংসদে স্পিকারের যথাযথ ভূমিকা পালনে ব্যর্থতা, নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনের অযোগ্যতা, গণতান্ত্রিক কাঠামোর বড় অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে। গণতন্ত্রের অন্যতম মানদণ্ড সিভিল সোসাইটি দেশে যথাযথ মান অর্জন করতে সক্ষম হয়নি। শুধু তা নয় সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠায়ও দলীয়করণের ছাপ পরিলক্ষি হয়। দেশে বিদ্যমান সিভিল সমাজের কিছু অংশ আওয়ামীলীগ সমর্থিত যারা আওয়ামীলীগের পক্ষে কথা বলে এবং বি এনপির বিপক্ষে বলে, অন্যদিকে কিছু অংশ বিএনপি সমর্থিত সিভিল সমাজ যারা বিএনপির পক্ষে ভাল এবং আওয়ামীলীগের বিপক্ষে বলে, এ থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে সিভিল সমাজও গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপায়নে যথাযথ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে।

গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকায়নে নাগরিকদের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্মে দাঁড়াতে হবে। নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে নাগরিকরা মতঐক্য প্রতিষ্ঠা করলে কিছুটা হলেও গণতন্ত্রের মানোন্নয়ন ঘটায় সম্ভাবনা রয়েছে, প্রথমতঃ ভোটারদের অবশ্যই সৎ ও যোগ্য প্রার্থীদের ভোট দিতে হবে, এ জন্য নির্বাচনী আইনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সব তথ্য প্রদান বাধ্যতামূলক করতে হবে এবং সেগুলো পত্র-পত্রিকা ও ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ ন্যায়পাল, মানবাধিকার কমিশন, স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, মহাহিসাব নিরিক্ষকের দপ্তরসহ যেসব জাতীয় প্রতিষ্ঠানে জবাবদিহি নিশ্চিত করা প্রয়োজন, সেগুলোতে সঠিক নিয়োগ পক্রিয়া মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্য, গ্রহণযোগ্য ও নিষ্ঠাবান লোক নিয়োগ দিতে হবে।

এছাড়াও গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিককীকরণে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে। যথা:

প্রথমত: কালো টাকা, সশস্ত্র ক্যাডার, জঙ্গিবাদ ও দলীয়করণের প্রভামুক্তভাবে সঠিক অর্থে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনই কেবল সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কার্যকর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ গণতন্ত্রকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সঠিক ক্রিয়াশীলতা এবং নাগরিক আন্দোলনকারীদের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিকে এগিয়ে নেয়া। এর অর্থ হলো গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করা এবং গণতন্ত্রের মৌলিক মূল্যবোধগুলো উর্ধ্বে তুলে ধরা।

এজন্য আমাদের অবশ্যই যে কাজগুলো করতে হবে তা হলোঃ ক) আইনের শাসন এবং আইনের চোখে সবাই সমান সে সত্যটিকে কার্যকর করে তুলতে হবে, খ) ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে, গ) ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে প্রভাব আছে এমন নীতি গ্রহণে কার্যকর আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে, ঘ) সংসদ, সংদীয় কমিটি ও নজরদারি সংস্থাগুলো সহ গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে শক্তিশালী ও কার্যকর করতে হবে, ঙ) সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজকর্মে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতি নিশ্চিত করতে হবে, চ) সব স্তরে বিচারবিভাগ স্বাধীন, নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক এবং তাদের কাজকর্মের জন্য জবাবদিহি করবে, ছ) পুলিশ ও প্রশাসনকে অবশ্যই নির্দলীয়ভাবে ও নিরপেক্ষ বিচারে তাদের দায়িত্ব পালন করতে হবে, জ) সাম্প্রদায়িকতা রাজনীতির জন্য ধর্মের ব্যবহার থেকে জঙ্গীবাদ, অসহনশীলতা ও সন্ত্রাসবাদ এবং যেকোনো ধরনের বৈষম্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে হবে।

তথ্যনির্দেশিকা

[১] আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, "বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠান নির্মাণ,"তারেক শামসুর রেহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশ রাজনীতির চার দশক*, (ঢাকা: শোভা প্রকাশ, ২০০৯), পৃ. ৫।

[২] S.P. Hartington, *Political Order in Changing Societies*, (New Heaven: London: Yale University press, 1968), p. 12.

[৩] ধীরাজ কুমার নাথ, *গণতন্ত্র: সংকট ও উত্তরণ*, (ঢাকা: কথা প্রকাশ, ২০০৯), পৃ. ১১।

[৪] Rounaq Jahan, "The Challenges of Institutionalising Democracy in Bangladesh" *ISAS Working Paper,* No. 39, Tower Block, Singapore, March 2008, p.1.

[৫] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১২ জুন ২০১১।

[৬] Rehman Sobhan, "Mediating Political Conflict in A Confrontational Environment: The Experience of The G-8 in *Journal of Bangladesh Studies,* 1(2), June 2000, p. 4.

[৭] Rounaq Jahan, *Opcit.* p. 3.

[৮] *Ibid.*

[৯] *Ibid.*

[১০] Rounaq Jahan, "Bangladesh" in *Countries at the Crossroads: A Survey of Democratic Governance*, Freedom House, New York 2005; and Rehman Sobhan, "Structural Dimensions of Malgovernance in Bangladesh", *Economic and Political Weekly*, Bombay, EPW Special Article, 4 September 2004.

[১১] Juan Liaz and Alfred Stepan, "Towards Consolidated Democracies," *Journal of Democracy*, 7(2), pp 14-33, 1996.

[১২] Robert Dahl, Democracy and Its Crisis (New Haven, CT: Yale University Press, 1989), p.72 in Dr. M. Aminur Rahman & Md. Sultan Mahmud, "Politics, Transition and Democratization in Bangladesh: An Analysis" *Development Compilation,* Vol. 01. No.02, 2009.

[১৩] মওদুদ আহমেদ, *দক্ষিণ এশিয়া উন্নয়নের সংকট: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত* (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ২০১০), পৃ. ২৩৬।

[১৪] *তদেব*।

[১৫] আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের রাজনীতি: সংস্কৃতির স্বরূপ* (ঢাকা: অনন্যা, ২০০৭), পৃ. ১৩৮।

[১৬] শ্যামল সরকার, "কোনো তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিতর্কের উর্ধ্বে ছিল না" *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৩১ মে ২০১২।

[১৭] *তদেব*।

[১৮] এস. এম. এক্রাম উল্যাহ ও মো. সুলতান মাহমুদ, "বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন: বৈধতার স্বরূপ সন্ধান" *আই বি এস জার্নাল*, ২০১১, পৃ.৮৬।

[১৯] রতনতনু ঘোষ (সম্পা.), *গণতন্ত্র: স্বরূপ সংকট সম্ভাবনা* (ঢাকা: কথা প্রকাশ, ২০১২), পৃ. ৮০।

[২০] Fahim Quadir, "Bangladesh" in *Countries at the Crossroads, Survey of Democratic Governance*, Freedom House 2007 http://www.freedomhouse.org.

[২১] Rounaq Jahan, "The Challenges of Institutionalising Democracy in Bangladesh" *Opcit.*p.14.

[22] *দৈনিক প্রথম আলো*, ১ জুলাই ২০১১।

[২৩] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২ নভেম্বর ২০০৭।

[২৪] Fahim Quadir, *Opcit.*

[২৫] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২০ জানুয়ারি ২০০২।

[২৬] Rounaq Jahan, "The Challenges of Institutionalising Democracy in Bangladesh" *Opcit.*p.16.

[২৭] *Ibid.*

[২৮] মুহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার, *অভিনব সরকার ব্যতিক্রমি নির্বাচন* (ঢাকা: এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউজ, ২০০৯), পৃ. ১১।

[২৯] আবুল ফজল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩১৭।

[৩০] *দৈনিক প্রথম আলো*, ৭ জুলাই ২০০৪।

[৩১] *দৈনিক যুগান্তর*, ১০ অক্টোবর, ২০০৪।

[৩২] মওদুদ আহমেদ, *প্রাগুক্ত*।

[৩৩] Rounaq Jahan, *Opcit.*

[৩৪] *Ibid.*

[৩৫] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২২ আগষ্ট ২০০৪।

[৩৬] *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৮ জানুয়ারি, ২০০৫।

[৩৭] মওদুদ আহমেদ, *প্রাগুক্ত*।

[৩৮] সুলতান মাহমুদ রানা, "সীমান্ত হত্যার কি বিচার নেই?" *দৈনিক যুগান্তর*, ১ ফেব্রুয়ারি ২০১২।

[৩৯] এমাজ উদ্দিন আহমেদ, "মহাজোট সরকারের তিন বছর", *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১২।

[৪০] আ স ম ফিরোজ-উল-হাসান, "বাংলাদেশের দুর্নীতি: একটি পর্যালোচনা", "তারেক শামসুর রেহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশ রাজনীতির চার দশক*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৩।

[৪১] আবুল ফজল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৩।

[৪২] *তদেব*।

[৪৩] মুহাম্মদ ইয়াহিয়া অখতার, 'দুর্নীতি দমন কমিশনের সূচনার বয়ান' *দৈনিক প্রথম আলো*, ১০ এপ্রিল, ২০০৫।

[৪৪] বাংলাদেশে দুর্নীতি: একটি খানা জরিপ, ২০০৫, টিআইবি।

[৪৫] *তদেব*।

[৪৬] বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, দি স্টেট অব গভর্নেন্স ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স স্টাডিজ, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, ২০০৮।

[৪৭] বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, অডিটর জেনারেল বাংলাদেশ (এজিবি) এর অডিট প্রতিবেদন।

[৪৮] বাংলাদেশে দুর্নীতি: একটি খানা জরিপ, *প্রাগুক্ত*।

[৪৯] আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স (১৯৯১-২০০৭), (ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ২০০৯), পৃ. ১৪২।

[৫০] *তদেব*।

[৫১] মো. সুলতান মাহমুদ, "বাংলাদেশে রাজনৈতিক উন্নয়ন (১৯৯১-২০০১): একটি মূল্যায়ন" *উন্নয়ন সংকলন*, Vol.04. No.01, August 2010. p.141.

[৫২] মো. শামসুর রহমান, "সিভিল সমাজ ও গণতন্ত্র: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত"; তারেক শামসুর রেহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও রাজনীতি*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭।

[৫৩] দিলারা রহমান ও মোহাম্মদ আমিরুল হক, "সিভিল সোসাইটি ও বাংলাদেশ", তারেক শামসুর রেহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশে রাজনীতির চার দশক*, *প্রাগুক্ত*, পৃ.৩৪১।

[৫৪] Myron Weiner, "Political Participation" in Binder et. al., Crises and Sequences in Political Development (Priceton, 1971), p.164.

[৫৫] আবুল ফজল হক, *প্রাগুক্ত*।

[৫৬] সুলতান মাহমুদ রানা, "রুখতে হবে ষড়যন্ত্র", *দৈনিক যুগান্তর*, ২২ ডিসেম্বর ২০১১।

[৫৭] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ জুলাই ২০০২।

[৫৮] A N M Nurul Haque, "The Administrations War against the Media', *The Daily Star,* 25 April 2006.

[৫৯] *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১ জুন ২০১২।